**মতামত**

**নোট ছাপানো ও ধ্বংসের প্রক্রিয়ায় সংস্কার জরুরি**

**প্রকৌশলী রিপন কুমার দাস**

**দৈনিক প্রতিদিনের সংবাদ**

প্রকাশ : ১১ সেপ্টেম্বর ২০২০, ০০:০০

vপ্রতি বছর ছেঁড়া, ফাটা, পোড়া, রঙ দেয়া, পোকায় খাওয়া, ময়লাযুক্তসহ পুরনো বাতিল টাকা পোড়ানো হয় ৭ হাজার ৭১ কোটি ৯৭ লাখ ৬৮ হাজার ৪০ টাকা। এর মধ্যে সবচেয়ে বেশি পোড়ানো হয় ৫ টাকা, ১০ টাকা ও ২০ টাকার নোট। পোড়ানো এ টাকার মধ্যে ৫ টাকার নোট সংখ্যা ১৯ কোটি ৯৩ লাখ ২২ হাজার ৭০টি, ১০ টাকার নোট ২০ কোটি ৩১ লাখ ৩৩ হাজার ২৮টি, ২০ টাকার নোট ৪৫ কোটি ৬২ লাখ ১০ হাজার ৩৩টি, ৫০ টাকার নোট ৬৫ কোটি ৩৮ লাখ ১,৪৪৫টি, ১০০ টাকার নোট ১৫ কোটি ৬৬ লাখ ৭৯ হাজার ৫১৯টি, ৫০০ টাকার নোট ৮ কোটি ৬১ লাখ ৫৯ হাজার ৮৩২টি এবং ১০০০ টাকার নোট রয়েছে ৪৭ লাখ ৬২ হাজার ৪৬৬টি। টাকার অঙ্কে ৫ টাকার নোটের মূল্যমান ৯৯ কোটি ৬৬ লাখ ১০ হাজার ৩৫০ টাকা, ১০ টাকার নোটের মূল্যমান ২০৩ কোটি ১৩ লাখ ৩০ হাজার ২৮০ টাকা, ২০ টাকার নোটের মূল্যমান ৯১ কোটি ২৮ লাখ ২০ হাজার ৬৬০ টাকা, ৫০ টাকার নোটের মূল্যমান ৩২৬ কোটি ৯০ লাখ ৭২ হাজার ২৫০ টাকা, ১০০ টাকার নোটের মূল্যমান ১ হাজার ৫৬৬ কোটি ৭৯ লাখ ৫১ হাজার ৯০০ টাকা, ৫০০ টাকার নোটের মূল্যমানের ৪ হাজার ৩০৭ কোটি ৯৯ লাখ ১৬ হাজার, এক হাজার টাকার মূল্যমানের ৪৭৬ কোটি ২৪ লাখ ৬৬ হাজার টাকা। এই ৭ প্রকার মুদ্রার মোট নোটের সংখ্যা ৭৬ কোটি ১০ লাখ ৫৯ হাজার ৪২৩টি।

১ হাজার টাকার একটি নোট ছাপাতে প্রায় ৭ টাকা, ৫০০ টাকার একটি নোট ছাপাতে ৬ টাকা, ১০০ টাকার নোট ছাপাতে সাড়ে ৪ টাকা, ৫০ ও ২০ টাকার একটি নোট ছাপাতে ২.৫ টাকা, ১০ টাকার নোট ছাপাতে ২.২০ টাকা এবং ৫ টাকার নোট ছাপাতে আনুমানিক ২ টাকা খরচ হয়। বাংলাদেশ ব্যাংক ও দ্য সিকিউরিটি প্রিন্টিং করপোরেশন লিমিটেড (টাকশাল)-এর তথ্য মতে, প্রতিবছর ৩০ থেকে ৩৫ শতাংশ টাকা নষ্ট বা অপচয় হয়। টাকশাল গড়ে প্রতিবছর ২ থেকে ১০০০ টাকা মূল্যমানের ১০০ কোটি পিস নোট ছাপায়। প্রতিটি নোট ছাপাতে বর্তমানে গড়ে প্রায় সাড়ে তিন টাকার অধিক খরচ হয়। সে হিসেবে ১০০ কোটি পিস নোট ছাপাতে সরকারের খরচ কত সেটি বিবেচনা করা যেতেই পারে। আর টাকা তৈরির কাঁচামালের অধিকাংশ আমদানি করতে হয় বলে মুদ্রার অবমূল্যায়ন, কাঁচামালের দাম বাড়া ও অন্যান্য খরচ বেড়ে যাওয়ায় প্রতিবছরই উৎপাদন খরচ বেড়ে যাচ্ছে।

বিগত ২০১৬-১৭ অর্থবছরে নগদ টাকা ছাপতে বাংলাদেশ ব্যাংকের বছরে খরচ হয় ৪৪৭ কোটি টাকা। আর ছাপানো টাকা পরিবহন ও ছাপানোর সঙ্গে সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা-কর্মচারীদের বেতন-ভাতা পরিশোধ করতে ব্যয় হয় আরো তিন কোটি টাকা। তবে নগদ টাকার পেছনে মোট যে খরচ হয়, এই ৪৫০ কোটি টাকা তার মাত্র ৫ শতাংশ। বাকি ৯৫ শতাংশ খরচ হয় নগদ অর্থ লেনদেনে বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠান, দোকানপাট, করপোরেট প্রতিষ্ঠান, সরকারি ও ব্যক্তি পর্যায়ে। কেন্দ্রীয় ব্যাংকের মতে, সব মিলিয়ে নগদ অর্থ লেনদেনে গত অর্থবছরে বাংলাদেশের খরচ হয়েছে ৯ হাজার কোটি টাকা, যাকে খরচ না বলে ‘অপচয়’ বলা যেতে পারে। একটি প্রতিবেদনে ইলেকট্রনিক পদ্ধতিতে বাংলাদেশে অর্থ লেনদেনের হতাশাজনক চিত্র তুলে ধরা হয়েছে। এতে বলা হয়েছে, দেশের মোট লেনদেনের মাত্র ৬ শতাংশ ইলেকট্রনিক পদ্ধতিতে সম্পন্ন হয়। আর বিভিন্ন সেবা বিলের (গ্যাস, বিদ্যুৎ, টেলিফোন, পানির বিল) মাত্র ৮ শতাংশ এবং বিভিন্ন ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠানকে দেওয়া বিলের মাত্র ২.৬ শতাংশ ইলেকট্রনিক পদ্ধতিতে সম্পন্ন হয়।

২০১৫ সালে বাংলাদেশ থেকে পাচার হয়েছে ৯৮ হাজার কোটি টাকা। জিএফআই’র তথ্যমতে, গত সাত বছরে বাংলাদেশ থেকে সাড়ে চার লাখ কোটি টাকা পাচার হয়েছে। যা দেশের ২০১৯-২০২০ অর্থবছরের জাতীয় বাজেটের প্রায় সমান। প্রতি বছর গড়ে পাচার হয়েছে প্রায় ৬৪ হাজার কোটি টাকা। সংস্থাটির মতে, বাংলাদেশের মোট বাণিজ্যের প্রায় ১৯ শতাংশই কোনো না কোনোভাবে পাচার হচ্ছে। গত ১০ বছরে ৬ হাজার ৩০০ কোটি ডলার সমপরিমাণ অর্থ বাংলাদেশ থেকে পাচার হয়েছে। জিএফআই এবার অর্থ পাচারের হিসাবে একটু পরিবর্তন এনেছে। ফলে অর্থ পাচারের পরিমাণ বেড়ে যাওয়ার তথ্য উঠে এসেছে। পণ্য বা সেবা আমদানিতে ওভার ইনভয়েসিং এবং রফতানিতে আন্ডার ইনভয়েসিংয়ের মাধ্যমে এ অর্থ পাচার হচ্ছে বলে রিপোর্টে উল্লেখ করা হয়। প্রতিবেদনে আরও বলা হয়েছে, বাংলাদেশ থেকে ২০০৫ সালে ৪২৬ কোটি ডলার, ২০০৬ সালে ৩৩৭ কোটি ডলার, পরের বছর ২০০৭ সালে ৪০৯ কোটি ডলার পাচার হয়। ২০০৮ সালে পাচারের পরিমাণ ৬৪৪ কোটি ডলার দাঁড়ায়। ২০০৯ সাল থেকে পরবর্তী দু’বছর অর্থ পাচার কিছুটা কমে আসে। ওই বছর ছিল ৫১০ কোটি ডলার। এছাড়া ২০১০ সালে ৫৪০ কোটি, ২০১১ সালে ৫৯২ কোটি ডলার সমপরিমাণ অর্থ পাচার হয়। ২০১২ সালে পাচার হয় ৭২২ কোটি। সা¤প্রতিক সময়ে ভুয়া রফতানি এলসি (ঋণপত্র) এবং ক্রয়চুক্তির মাধ্যমে এসব টাকা পাচার হচ্ছে।

বর্তমানে দেশের ২১ খাতে ৪৪ দেশের ২ লাখ ৫০ হাজার বিদেশি নাগরিক কাজ করছেন। এর মধ্যে কর দিচ্ছেন ৯ হাজার ৫০০ জন। বাকি ২ লাখ ৪১ হাজার অবৈধ। এরা বেতনের নামে দেশ থেকে বছরে ২৬ হাজার ৪০০ কোটি টাকা পাচার করছেন। যা পদ্মা সেতুর মোট ব্যয়ের প্রায় সমান। এর ফলে সরকার রাজস্ব হারাচ্ছে ১২ হাজার কোটি টাকা। দুর্নীতিবিরোধী টিআইবি এর গবেষণায় এ তথ্য উঠে এসেছে। প্রতিবেদনে আরও বলা হয়, এদের ন্যূনতম মাসিক বেতন ১ হাজার ৫০০ মার্কিন ডলার। আর বিদেশি কর্মীদের মোট বার্ষিক আয় ৪ দশমিক ৫ বিলিয়ন ডলার। এর মধ্যে দেশে নিয়ে যায় ৩ দশমিক ১৫ বিলিয়ন ডলার। প্রতি ডলার ৮৫ টাকা হিসাবে স্থানীয় মুদ্রায় এর পরিমাণ ২৬ হাজার ৭৭৫ কোটি টাকা। এর মধ্যে বৈধভাবে নিয়ে যাচ্ছে ৩৯১ কোটি এবং অবৈধভাবে ২৬ হাজার ৪০০ কোটি টাকা। এর ফলে বছরে সরকারের রাজস্ব ক্ষতি ১২ হাজার কোটি টাকা।

ময়লা টাকায় রয়েছে ই-কোলাই ও ফেকাল কলিফর্ম জাতীয় ব্যাকটেরিয়া, যা স্বাস্থ্যের জন্য খুবই ঝুঁকিপূর্ণ। স্টাডি অন দ্যা ব্যাকটেরিয়াল কন্টামিনেশন অন পেপার মানি অ্যান্ড কয়েনস অব খুলনা সিটি এরিয়া নামক গবেষণায় দেখা গেছে মাংসের দোকান থেকে সংগ্রহ করা টাকার নোটে সর্বাধিক ২৬৭০টি ই-কোলাই ব্যাকটেরিয়া, মাছ বিক্রেতার টাকায় ২৬০০, মুরগি বিক্রেতার টাকায় ২৩০০ ই-কোলাই ব্যাকটেরিয়া এবং মাছ ও মুরগি বিক্রেতার টাকায় ২৮০০ এবং মাংসের দোকানের টাকায় ২৬০০ ফেকাল কলিফর্ম ব্যাকটেরিয়া পাওয়া যায়। অন্যান্য উৎস থেকে সংগ্রহ করা টাকায়ও এ দুটি ব্যাকটেরিয়া মিলেছে, তবে সেগুলো ১০০০-এর নিচে রয়েছে। এছাড়া মাছ বিক্রেতার দোকান থেকে সংগ্রহ করা কয়েনে ২৬০০ ই-কোলাই ব্যাকটেরিয়া, মুরগির দোকানের কয়েনে ২৪৮০, জুস বিক্রেতার কয়েনে ২৬০০, মাংসের দোকানের কয়েনে ২১৩০, পথ খাবারের দোকানের কয়েনে ১৭৯০ ও ফুচকার দোকানের কয়েনে ১২৫০ ই-কোলাই ব্যাকটেরিয়া পাওয়া যায়। মুরগির দোকানের কয়েনে ২৯০০, মাছ বিক্রেতার কয়েনে ২৮০০, মাংস বিক্রেতার কয়েনে ২৬৬০, ফল বিক্রেতার কয়েনে ২০৬০, পথ খাবারের দোকানের কয়েনে ১৫৭০, ফুচকা বিক্রেতার কয়েনে ১৪৬০, সাধারণ মানুষের কয়েনে ১২০০, ভিক্ষুকের কয়েনে ১০৮০ ফেকাল কলিফর্ম ব্যাকটেরিয়া পাওয়া যায়। অন্যান্য উৎস থেকে সংগ্রহ করা কয়েনেও এ দুটি ব্যাকটেরিয়া মিলেছে, তবে সেগুলো ১০০০ এর নিচে। টাকায় যে ব্যাকটেরিয়া রয়েছে, তা পেটে গেলে বিভিন্ন রোগে আক্রান্ত হওয়ার আশঙ্কা রয়েছে। এছাড়া প্রস্রাবের ইনফেকশনও হতে পারে।

এছাড়া দেশের অভ্যন্তরে অনেক কুচক্রী ও স্বার্থন্বেসী মহল দ্বারা কয়েক শত কোটি টাকার জাল মুদ্রার তৈরি ও বাজারজাতকরণের মাধ্যমে দেশের অর্থনীতিতে বিরুপ প্রভাব বিস্তার করছে । আয়কর ও ভ্যাট প্রদানের ক্ষেত্রে নানা অনিয়মের ফলে সরকার হাজার হাজার কোটি টাকা রাজস্ব হারাতে বাধ্য হচ্ছে। বর্তমানে দেশে শতকরা ১ ভাগ লোক আয়কর দিয়ে থাকেন, যদি দেশের আয়কর প্রদানের উপযুক্ত ব্যক্তিগন আয়কর প্রদান করত তাহলে বছরে ১ লক্ষ ১১ হাজার ৯০০ কোটি টাকা অতিরিক্ত আদায় করা সম্ভব হত । এ সকল অব্যবস্থাপনা থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য দেশে মুদ্রাবিহীন অর্থনীতি চালুকরা একান্ত প্রয়োজন।

এ জন্য দেশের ১০ বছরের উর্ধে সকল নাগরিকের জন্য ব্যাংক একাউন্টসহ একটি মাত্র মোবাইল ব্যাংকিং হিসাব চালু করা যেতে পারে। একজন নাগরিকের একটি মাত্র মোবাইল ব্যাংকিং হিসাব থাকবে যার নম্বর জাতীয় পরিচয় পত্রের নম্বর অনুযায়ী নম্বর অনুযায়ী হবে। এছাড়া একজন ব্যক্তি বর্তমানের ন্যায় একাধিক ব্যাংক হিসাব পরিচালনা করতে পারবে, কিন্তু সকল ব্যাংক হিসাবের সাথে মোবাইল হিসাবের নম্বর যুক্ত থাকবে। এক্ষেত্রে পরিবারের সকল সদস্যর মোবাইল হিসাব নম্বর একটির সাথে অন্যটি যুক্ত করার প্রয়োজনীয়তা রয়েছে। যার ফলে একটি পরিবারের সকল সদস্যদের কি পরিমান টাকা লেনদেন হবে তা অনায়াসে সন্ধান করা সম্ভব হবে । সকল প্রকার আর্থিক লেনদেন অর্থাৎ ব্যাংকে টাকা জমা, ঋণ গ্রহন, ফিক্স ডিপোজিট করা, বীমা, রপ্তানি, আমদানী, সাধারণ ক্রয় বিক্রয় করা, ধার প্রদান, বিল প্রদান, বেতন ভাতাদি আদান ও প্রদান সহ সকল কার্যক্রম মোবাইলের মাধ্যমে সম্পন্ন হবে। মোবাইল ব্যাংকিং সিষ্টেমটি কোন বেসরকারী প্রতিষ্ঠানের থেকে সরবাসরি বাংলাদেশ ব্যাংক পরিচালনা করলে ভাল ফল পাওয়া যেতে পারে। এছাড়া প্রত্যেক মোবাইল হিসাবধারীর জন্য একটি চিপযুক্ত কার্ড (ডেভিট ও ক্রেডিট) প্রদান করার প্রয়োজন রয়েছে। এসএমএস ও এ্যাপস ভিত্তিকসহ সকল প্রকার লেনদেন হবে সম্পর্ন ফ্রি, লেনদেনের ক্ষেত্রে কোন চার্জ প্রদান করতে হবে না।

নগদবিহীন অর্থব্যবস্থার উপকারীতাঃ দেশে নোট ছাপানো ও নোট ধংস করার জন্য প্রায় প্রতি বছর ৯ হাজার কোটি টাকার অপচয় হয়ে থাকে এই অপচয় থেকে রক্ষা পাওয়া যাবে। প্রতি বছর প্রায় ৯৮ হাজার কোটি টাকা বিদেশে অর্থ পাচার রোধ করা সম্ভব হবে। বাংলাদেশে কর্মরত বিদেশীর আয় সম্পর্কে জ্ঞাত হওয়া যাবে ও ২৬ হাজার ৪০০ কোটি টাকা পাচার রোধ করা সম্ভব হবে। যেহেতু সকল কার্যক্রম ডিজিটাল পদ্ধতিতে হবে তাই জাল টাকার মাধ্যমে অর্থনীতি ধংসের যে পায়তারা চলছে তা রোধ করা সম্ভব হবে। যেহেতু মোবাইল ব্যাংকিং এর মাধ্যমে সকল কার্যক্রম পরিচালনা হবে, তাই দেশে ঘুষ গ্রহণের পরিমান শুন্য ভাগে নামিয়ে আনা সম্ভব হবে। কারণ একজন কর্মকর্তা বা কর্মচারী নিজের বা পরিবারের সদস্যর মোবাইল হিসাবে বেতনের অতিরিক্ত টাকা যোগ হওয়ার সাথে সাথে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ অবগত হতে পারবেন ও মোবাইল হিসাবটি স্থগিত করতে পারবেন। সংশ্লিষ্ট বছরের মোবাইল হিসাবের লেনদেনের উপর ভিত্তি করে সরাসরি আয়কয় ও ভ্যাট কর্তণ করার সুযোগ থাকবে। এক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তির নিকট কোন তথ্যাদি গ্রহন করার প্রয়োজন হবেনা । যদি অতিরিক্ত ভ্যাট বা আয়কর কর্তণ হয় তবে প্রয়োজনীয় তথ্যাদি প্রদান করে সমন্বয় করা যাবে। সকল প্রকার দুবৃত্তায়ন, লুটপাট, রাহাজানী, ডাকাতি, জমি দখল বন্ধ করা সম্ভব হবে। কারণ সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি কি করেন বিগত বছর সমুহে কি পরিমান আয়কর প্রদান করেছেন এবং হটাৎ করে তার মোবাইল হিসাবে অতিরিক্ত টাকা কিভাবে কি পরিমান যোগ হল তা জানা সম্ভব হবে। জমি ক্রয়-বিক্রয় সহ সকল আর্থিক লেনদেনে তথ্য গোপন করে সরকারের ভ্যাট ও করসহ অন্যান্য রাজস্ব ফাঁকি দেওয়ার সম্ভাবনা লোপ পাবে। মোবাইল হ্যাকিং ও ডিজিটাল পদ্ধতিতে অন্যায় ভাবে টাকা ট্রান্সফার করলে অভিযোগ পাওয়ার সাথে সাথে যতগুলো হিসাবে উক্ত টাকা টান্সফার হবে সকল মোবাইল হিসাব সমুহ স্থগিত করা সম্ভব হবে কারণ নগদ টাকা লেনদেন না হওয়ার ফলে টাকা উত্তোলন করা যাবে না ।

নগদবিহীন অর্থব্যবস্থার সর্তকতাঃ একই সাথে নদগবিহীন ও নগদ অর্থ ব্যবস্থা চালুকরা যাবে না । সরকারী বিল, বেতন ভাতা, কোম্পানী ও ব্যবসা প্রতিষ্ঠানের প্রাতিষ্ঠানিক লেনদেনের অর্থ ব্যতীত ব্যক্তিগত সকল অর্থ মাসিক আয়ের দ্বিগুনের বেশি হলেই মোবাইল হিসাব নম্বর স্থগিত করতে হব, তবে উপযুক্ত প্রমান সাপেক্ষে মোবাইল হিসাব পুনরায় চালু করা যাবে। বিদেশে অর্থ প্রেরণের ক্ষেত্রে সরাসরি অর্থ ট্রান্সফার না করে উপযুক্ত প্রমান সাপেক্ষে বাংলাদেশ ব্যাংকের অনুমোদন এর মাধ্যমে অর্থ ট্রান্সফার করা হবে । এক্ষেত্রে বাংলাদেশ ব্যাংকের একজন কর্মকর্তা তার নিজ দায়িত্বে অর্থ ট্রান্সফার করবেন, কোন সমস্যা হলে তিনি ব্যক্তিগত ভাবে দায়ী থাকবেন। সাইবার ক্রাইম ও আর্থিক অপরাধ দমনের জন্য প্রতিটি থানায় ওসি (সাধারণ), ওসি (তদন্ত) এর পাশাপাশি ওসি (আইটি) নামে পদ সৃষ্টি করতে হবে, ঐ পদে বিএসটি ইন কম্পিউটার ইঞ্জিনিয়ারিং অথবা ৩ বছরের অভিজ্ঞতাসহ ডিপ্লোমা ইন কম্পিউটার ইঞ্জিনিয়ারিং ডিগ্রিধধারীদের নিয়োগ প্রদান করা যেতে পারে। ওসি আইটি এর অধীনে টেকনিক্যাল ডিগ্রিধারী সাব ইন্সপেক্টর, সহকারী সাব ইন্সপেক্টর ও অন্যান্য প্রয়োজনীয় জনবল নিয়োগ প্রদান করতে হবে। নগদবিহীন অর্থব্যবস্থা চালু করা সম্ভব হলে কিছুটা হলেও অর্থ ব্যবস্থায় কিছুটা হলেও ১৯৭২ সনের মুল সংবিধানের সমাসজতন্ত্রের ধারায় ফিরে যাওয়া সম্ভব হবে।

প্রকৌশলী রিপন কুমার দাস

কলাম লেখক ও ট্রেড ইন্সট্রাক্টর

ডোনাভান মাধ্যমিক বিদ্যালয়,

পটুয়াখালী।